মঙ্গলবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪
বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ৩০৩

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায়ও জয়জয়কার মেয়েদেরই

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ও জয়জয়কার মেয়েদের। এর আগে শনিবার এই রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে ঝাঁকুড়ার অন্বেষা পাইন। আর সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম হলেন নয়ডার অ্যামিটি ইন্টারন্যাশনালের ছাত্রী রক্ষা গোপাল, শুধু তাই সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশ্যের পর দেখা যাচ্ছে যে প্রথম তিনটি স্থানই মেয়েদের দখলে। সবচেয়ে উল্লেখের হল, রক্ষা গোপাল দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় কলা বিভাগে ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন। এটা ভাবা যায় না। কারণ কলা বিভাগে ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই প্রথমাকে আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

আসলে সারা দেশেই দেখা যাচ্ছে মেয়েরা ভাল পড়াশোনা করছে। তারা পড়াশোনা অত্যন্ত মনোযোগী। তুলনামূলকভাবে ছেলেরা বাইরের জগতে নানা বিষয়ে যুক্ত হয়ে পড়ছে? পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে কখনও ভাল বা উল্লেখযোগ্য ফল করা যায় না। আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে সেটি হল, লেখা পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে,- এর অর্থ হল, ভাল ছাত্র-ছাত্রীরাই ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, গবেষক, বিজ্ঞানী ইত্যাদি হয়। আর এই পেশাই অর্থ আনে। আনে সম্মান, তাই এমন আপ্ত বাক্যটিকে যেন আমরা ভুলে না যাই।

সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৯.৪ শতাংশ নম্বর। পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন বিজ্ঞানের ছাত্রী তুমি। আর যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছেন বাণিজ্য শাখার ছাত্রী মন্নত এবং ছাত্র আদিত্য। এবা পেয়েছেন ৯৯.২ শতাংশ নম্বর তবে গত বছরের তুলনায় এই পরীক্ষায় পাশের হার কমেছে। এটা কেন হল তা খতিয়ে দেখা দরকার সিবিএসই বোর্ডের।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

[কামিনী-কাঞ্চন পণ্ডিতকেও হীনবুদ্ধি করে-----বিষয়ীর পূজাদি]

ঠাকুরের দর্শন করিতে চৌধুরী বাবুর আসিবার কথা ছিল।

মনোমোহন—চৌধুরিআসবেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপুরের সেই বাঙ্গাল (শশধর) আসবে—তবে যাব না!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কী হীনবুদ্ধি !—বিদ্যার অহঙ্কার তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে,—ধরাকে সরা মনে করেছে!

চৌধুরী এম, এ, পাশ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। আবার তিনি বিবাহ করিয়াছেনয় তিন চার শত টাকা মাহিনা পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ভক্তদের প্রতি)—এই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি মানুষকে হীনবুদ্ধি করেছে। হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭/১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে। (সকলের হাস্য)। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বল্লাম, 'যা এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন করছে।'

কর্তাভজা চন্দ্র (চাটুয্যে) আসিয়াছেন। বয়ক্রম ষাট পঁয়ষট্টি। মুখে কেবল কর্তাভাজনের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো বেশ হিসাবি কথা বলছে।' ভক্তরা হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্তপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন। অন্তপুরে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহাস্যবদন। বলিলেন, "আমি পাইখানার কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন করলাম। আর একটু ফুল টুল দিলাম।

"বিষয়ীদের পূজা জপ, তপ যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই রাম ওঁ জপ করে। জ্ঞান পথের লোকেরাও 'সোঽহং' জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে।"

"সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত।" *(ক্রমশ)*

দিনপঞ্জিকা

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ভাং, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ৩০ মে, ১৫ জেঠ,
সংবৎ, ৫ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৩ রামজন। সূর্য্যোদয় ঘঃ। ৪।৫৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৪।

মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ঘ ২।২০ মিঃ। পুষ্যানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩০ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ দিবা ঘ ৯।৩৩ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ২।২০ গতে কৌলবকরণ, রাত্রি ঘ ১।৩১ গতে তৈতিলকরণ।

জন্মে—কর্কটরাশি পিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা।

মৃতে—একপাদদোষ। **বারবেলাদি**—ঘ ৬।৩৬ গতে ৮।১৫ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৫৪ মধ্যে। **কালরাত্রি**—ঘ ৭।৩৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে।

যাত্রা—শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ঘ ১০।৪৪ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণে ও নিষেধ, দিবা ঘ ২।২০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ঘ ২।৫৪ গতে পুনঃযাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।৩০ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৬ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। **বিবিধ**—পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ভাং, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ৩০ মে, ১৫ জেঠ, ৩ রমজান উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।১৪ মঙ্গলবার, পঞ্চমীদিবাঘঃ ২।২০।সে শেষ ৩।১৯ইফতার ৬।২৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

'মেক ইন ইন্ডিয়া' কে জোরদার করার স্বার্থে নয়া উদ্যোগ 'বায় ইন্ডিয়া'

প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে মোদীর 'ফ্ল্যাগশিপ' প্রকল্প

সুব্রত মজুমদার

এনডিএ সরকারের তিন বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট কার্ড পেশ করতে গিয়ে নীতি আয়োগ ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়া মোদীর অর্থনীতিকে চান্সা করার জোরদার লড়াইকে তুলে ধরেছেন। অন্তত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের মর্মার্থ তাই। কিন্তু, রহস্যজনকভাবে তিনি মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প সম্পর্কে নীরব। যা মোদীর নয়া ভারত গড়ার স্বপ্নে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। সিদ্ধান্তগ্রহণে পঙ্গুত্ব, পরিকাঠামো প্রকল্পে ধীর উন্নতি, দুর্নীতি প্রতিরোধে অপারগতা এবং এর সম্ভাসবাদ রুখতে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি মোদী হয়েছেন, সেখানে সাফলের খতিয়ান পানাগড়িয়া তুলে ধরেছেন। কিন্তু, সেখানে কোথাও নেই মেক ইন ইন্ডিয়া সম্পর্কে কোনও তথ্য। তাহলে কি এই প্রকল্প লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ?

যদি সংখ্যাতত্ত্বকে বিশ্বাস করা হয়, তাহলে বলতে হবে, মেক ইন ইন্ডিয়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনও বদল আনতে পারেনি। তা এখনও অতি ধীর গতিতে চলছে। যার মাত্রা দুই শতাংশের আশেপাশে। যদিও পরের দিকে তা পাঁচ শতাংশে পৌঁছেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল সরাসরি মেলে নয়া কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে। সেখানেও আশাহত হতে হবে। বেরসরকারি বিনিয়োগ আহামরি নয়। রফতানি বৃদ্ধির পরিমাণও সমান্তরাল অবস্থায় রয়েছে। অন্যভাবে বললে, মেক ইন ইন্ডিয়াকে ঘিরে যে স্বপ্নজাল বোনা হয়েছিল। তার ফল এখনও পর্যন্ত ভাল নয়। তার মুখ্য কারণ, নীতি নির্ধারণে ও কার্যক্ষমতা প্রদর্শনে অক্ষমতা। বিশ্ব বাজার যখন মন্দাক্রান্ত, দেশীয় বাজার মুদ্রাস্ফীতি ফেরে ধুঁকছে, বাজার তার ওজন হারিয়েছে-তখনও এখানকার বাজার জনসংখ্যার জোরে উর্ধ্বগামী। এই প্রেক্ষাপটে 'বায় ইন্ডিয়া' কিন্তু মেক ইন ইন্ডিয়াকে নতুন জীবন প্রদান করতে পারে।

দেশীয় বাজারকে চাঙ্গা করতে বায় ইন্ডিয়া প্রকল্পের ভাবনা। যেখানে থাকবে আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। মুখ্য বিষয় দুটি। এক, সরকারি সংগ্রহ এবং দুই, রফতানি ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা। এভাবে দেশীয় বাজারকে সজীব করে তোলার ব্যবস্থা করা যায়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে সরকারি সম্পদ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। প্রতি বছর সরকার অধিগৃহীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১২ থেকে ১৫ লক্ষ কোটি টাকার জিনিস কেনে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব তাই বলছে। সবচেয়ে বড় ক্রেতা প্রতিরক্ষা, রেল, টেলিকম এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা। প্রতিরক্ষা, রেল এবং টেলিকম প্রায় ৫০ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় ২৬ শতাংশ তাদের বাজেট অর্থ থেকে এই খাতে খরচ করে।

সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এক নীতিতে যে কারণে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই নীতি অনুযায়ী, স্থানীয় উৎপাদকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে যেকোনও ক্রয়ে স্থানীয় উৎপাদককে এই সুযোগ দিতে হবে। একইভাবে রফতানি বিকল্প ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের এক প্রেসনোট অনুযায়ী, মেট্রো রেল সম্পর্কিত যেকোনও যন্ত্রাশ দেশীয় সংস্থা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। মেট্রো রেলের কামরা এবং 'ক্রিটিকাল সিগনালিং ইকুইপমেন্ট'-এর ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের মেট্রো প্রকল্পের কর্তৃপক্ষকে দেশীয় সংস্থা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

তথ্য বলছে, আগামী তিন বছরে দেশে ১৬০০ এমন কামরা দরকার। এছাড়া আরও অন্তত ২৭টি মেট্রো পরিষেবা কার্যকর হওয়ার কথা। যেগুলির পরিকল্পনা চলছে। ২০১৮ সালের মধ্যে সেগুলি চালু হতে পারে। সেখানে দেশে তিনটি সংস্থার মেট্রো রেলের কামরা বানায়। একটি চিনা সংস্থা নাগপুরে চতুর্থ কারখানা স্থাপন করতে চলেছে।

মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং আধুনিক শিল্পের মেলবন্ধনে ঘটানোর প্রচেষ্টা ছিল। যদিও এই দুই ধরনের শিল্পের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আধুনিক শিল্পের চ্যালেঞ্জ ইলেকট্রনিকস, অটোমোবাইল, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সেখানে ঐতিহ্যসম্পন্ন শিল্প আঙিনায় রয়েছে বস্ত্র, কৃষি ভিত্তিক এবং হস্তশিল্প। এই দুই ক্ষেত্রের জন্য যে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতি দরকার, সেই প্রসঙ্গে মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ ছিল নীরব। কারণ, ঐতিহ্যসম্পন্ন শিল্পে সর্বপ্রধান দরকার নয়া যন্ত্র পাতি। সেখানে আধুনিক শিল্পে কারিগরি দিক থেকে প্রয়োজন সমসাময়িকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা। দুই ক্ষেত্রেই দরকার নীতিগত সহায়তা, যার মধ্যে থাকবে আর্থিক উৎসাহভাতা, বাজারগত সহায়তা। মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল চালু নীতির ভিত্তিতে। সেখানে থাকা ঘাটতি স্বীকার করেছে সংসদীয় প্যানেল।

তারা বলেছে, পুঁজি ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন শিল্পের ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি) ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ ও নীতি প্রয়োজন। যা আদতে উৎপাদন বৃদ্ধির মূল স্তম্ভ। যে কারণে তারা সুপারিশ করেছে, যে, 'ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি'র বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ভরতুকি দেওয়া দরকার।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

ডেঙ্গু মোকাবিলায় জরুরি দু-চার কথা

ডা. ডি মাঝি ও ডা. ডি রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর....

বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রতিষেধকের পরীক্ষা চলছে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কিছু ডেঙ্গু অধ্যুষিত রাষ্ট্রে। এটি ৯ থেকে ৪৫ বছর বয়সের জন্য নির্ধারিত, যদিও এটি সব জায়গায় এখনও পর্যন্ত উপলব্ধ নয়। যতদূর জানা গেছে, এই প্রতিষেধক ৬০ শতাংশ কার্যকারী। যেমন ডেন ৩ ও ডেন ৪-এর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। ডেন ১-এর ক্ষেত্রে মাঝামাঝি ও ডেন ২-এর ক্ষেত্রে খুব কমই কার্যকরী।

ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশা দেখতে ছোট (৫ মিলিমিটার), কালো রং, গায়ে ও পাঁটে সাদা সাদা বিন্দু থাকে। এই মশা প্রধানত দিনের বেলার কামড়ায়, যদিও রোদ ওঠার ২ ঘণ্টার পর্যন্ত আর বিকাল ও গোধূলিবেলায় কামড়ানোর প্রবণতা বেশি থাকে। এই মশা বাড়ির ভিতরে ও আশেপাশে মানুষকে কামড়ায় এবং বাড়ির অন্ধকার কোণে বা কোনও ঝুলন্ত বস্তু, যেমন--- জামকাপড়, ছাতা এবং আসবাব পত্রের নিচে বা পিছনে বিশ্রাম নেয়। এই মশার বাংবংবার কামড়ানোর প্রবণতা থাকে। কোনও পাত্রের সামান্য জমা জলেও এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলি বিনাজলে এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেও জল পেলে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। এডিস মশা সাধারণত যেখানে বৃষ্টির জল জমা হয় বা যেখানে জল জমা থাকে, যেমন---কুলার, ড্রাম, জার, পাত্র, বালতি, ফুলদানি, টবের নিচের রাখা প্লেট, ট্যাঙ্ক, বোতল, টায়ার, ছাদের গর্ত, ফ্রিজের নিচে, সিমেন্টের পাত্র, বাঁশের গুলি, নারকেল খোলা, ডাবের খোলা ও গাছের গুড়ির মধ্যে গর্তে ডিম পাড়ে।

তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, যেহেতু এই রোগের সংক্রমণ মানুষের থেকে মানুষে ছড়ায় না, সেহেতু যদি আমরা ডেঙ্গু রোগকে রোধ করতে চাই তাহলে যে কোনওভাবে নিম্নলিখিত দুই উপায় অবলম্বন করা জরুরি।

১) এডিস মশার কামড়ের থেকে নিজেদের বাঁচানো।

২) এডিস মশার জীবনচক্রকে ধ্বংস করা।

এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের কোনও প্রতিষেধক বা সারানোর কোনও ঔষধ নেই। তাই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ জনগণকে সচেতন করাই সব থেকে উপযুক্ত।

অতএব ডেঙ্গু মোকাবিলায় পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

১) নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায়:

ক) মসকিউটো রিপেলেণ্ট ক্রিম, ধূপ, তেল ইত্যাদির ব্যবহার।

খ) ফুলহাতা জামা ও প্যান্ট পরিধান করা।

গ) মশারি ব্যবহার করা, এমনকি দিনের বেলায় শোবার সময়েও।

ঘ) জানালায় মশার নেট বা জাল ব্যবহার করা।

২) মশার প্রজননের নিয়ন্ত্রণের উপায়:

ক) মশার প্রজননের স্থান নির্ণয় ও ধ্বংস করা।

খ) ছাদ, বারান্দা এবং সানশেড পরিষ্কার রাখা, যাতে সেখানে জল জমে না থাকে।

গ) ব্যবহারযোগ্য জমানো জলকে ঢিকঠাক ঢেকে রাখা।

ঘ) সপ্তাহে অন্তত একদিন জলের পাত্র খালি করে ঘষে পরিষ্কার করার অভ্যাস রাখা।

ঙ) নর্দমা, খানাখন্দ এবং জল জমা নিচু জমি পরিষ্কার ও শুকনো রাখা।

ডেঙ্গুপ্রতিরোধের জন্য গুপ্পাত্র কীটনাশকের উপর নির্ভর না করে কমিউনিটি ভিত্তিক সার্বিক বাহক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া উচিত। গণ মাধ্যমে দ্বারা প্রচার ছাড়াও স্কুল শিক্ষক ও ছাত্র, এন জি ও, কর্মী সংগঠন ও বাসিন্দাদের যৌথ প্রয়াসেই মানুষের আচরণগত পরিবর্তনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ির ভিতরে ও আশেপাশে জমা জল ও ছোটোখাটো পাত্রকে শুকনো ও পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ। ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকায় আগমনকারীদের নিজেকে রক্ষার্থে মশারি, হাত-পা ঢাকা জামাকাপড় এবং মশা তাড়ানোর ক্রিম ব্যবহার করা উচিৎ।

এত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও, কিছু গুরুতর বাধা-বিপত্তি থেকে যায়, যাকে অতিক্রম করা শক্ত। যেমন—

ক) ভিন্ন ধরনের সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব।

খ) প্রাকৃতিক উষ্ণতাবৃদ্ধি।

গ) মানুষের জীবনচর্যার পরিবর্তন যাতে মশার লার্ভা জন্মানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

ঘ) অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত জল সরবরাহ।

ঙ) সমাজব্যবস্থার দ্রুত আধুনিককীকরণ ও নগারায়ন।

এই ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্জ্য ক্ষেত্রে আবর্জনা দূরীকরণ, নর্দমা রক্ষণাবেক্ষণ, নিচু জমি ভরাট ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা দরকার। তবেই আমরা ডেঙ্গু রোগের বাহক নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির সফল রূপায়ণ করতে পারব। ***(সমাপ্ত)***

সম্পাদক সমীপেষু

ফুটবলের শেষ প্রহরী হলেন গোলরক্ষক

ফুটবলের শেষ প্রহরী হিসাবে বাইশ ফুট ও আটফুটের গোল পোস্টের নীচে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় তিনিই ফুটবলের গোলরক্ষক। একজন দক্ষ গোলরক্ষক কেবলমাত্র গোল প্রহরী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে না। একজন গোল রক্ষকই দেখতে পায় পুরো খেলার চেহারাটা। তাই একজন গোল রক্ষক খেলার পরিচালনাটাও করে। আর যখন গোলরক্ষকের কথা এসে যায় সেই গোলপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী গল্প। এখন মনে পড়ে যায় এমনই এক গোল রক্ষকের কথা। যিনি ভারতীয় দলের হয়ে ও ক্লাবের হয়ে গোল প্রহরীর ভূমিকা পালন করে গেছেন তিনি হলেন পিটার থঙ্গরাজ আজও আমাদের কাছে ফুটবল সেই জনপ্রিয়তার খেলা হিসাবে রয়েছে। আবার পিটার থঙ্গরাজও রয়েছে সেই ফুটবলের একজন সেনাপতি হিসাবে তিনি ১৯৫৮, ১৯৬২, এবং ১৯৬৬ সালে এশিয়ান গেমসে। নিজের পরিচয় দিয়ে গেছেন। অলিম্পিকেও তিনি ভারতের জার্সি পরে গোলপোস্টের নীচে প্রহরী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৫৬ সালে----অলিম্পিকেও ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকেও। রাধ করতে চাই তাহলে যে কোনরাধ করতে চাই তাহলে যে কোন১৯৬৪ সালে প্রি-অলিম্পিকেও তিনি ছিলেন। মারডেকা ফুটবলেও তিনি ভারতের জার্সি পরে গোলপ্রহরী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী ভারতীয় দলের গোলরক্ষক হিসাবে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে তিনি ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কলকাতার তিন প্রধান, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেও তিনি সেই গোল প্রহরী হিসাবে নিজের ভূমিকা পালন করে গেছেন। স্ট্রাইকারেরা যখন গোল করতে না পারে সেই ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়ে যায়। এবার পালা পড়ে ট্রাইবেকারে সেই সময় একজন গোলরক্ষক একটা শট বাঁচিয়ে দিয়ে দলকে জয়লাভ করতে সাহায্য করে। সেদিন গোলরক্ষই ত্রাতা এবং সেদিন সবার কাছে মহারাজা। পিটার থঙ্গরাজও মহারাজা ছিলেন বলেই। ভারত সরকার আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৬৭, সালে অর্জুন পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়ে ছিল। এমন একজন গোলরক্ষকের আজ তেমনভাবে উচ্চারিত হয় না। তিনি ২০০৬ সালের ২৫ নভেম্বরে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তবুও তিনি আছেন। একজন প্রহরীদার হিসাবে।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া-৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৯৭/২, এম জি রোড,
মিডিল পয়েন্ট,
পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়